**একাকীত্বের মুদ্রা, গোরা**

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

আজ কে গো মুরলী বাজায়
এ তো কভু নহে শ্যামরায়
ইহার গৌরবরণ করে আলো–

এই আলো আজ থেকে একশো বছর আগে নবফাল্গুনের দিনে কিরকম আলোকিত করে দিয়েছিল আমাদের কাহিনী সাম্রাজ্য সে আলোচনার প্রবেশ না করেই দেখতে পাই 'গোরা' আজও আমাদের ইতিহাস পরিসরে তুলনারহিত ভাবে প্রাসঙ্গিক ও সমকালীন। কিন্তু 'গোরা' সর্বজনস্বীকৃত নয়। এমনকি রবীন্দ্র - স্বাক্ষর সত্ত্বেও 'গোরা' বিষয়ে বাঙালি সমালোচকের সতর্ক ও সাবধানী পদক্ষেপ কানে আসা কিছু অস্বাভাবিক নয়। কেননা 'চতুরঙ্গ'র মত দূরপ্রসারী ও বিসর্পিল আখ্যানগতি তাতে নেই, অদৃশ্য হয়ে আছে 'চোখের বালি' বা 'নৌকাডুবি'র মত নাট্যধর্ম, 'গোরা' বরং শব্দের শিল্প কথার কারুবাসনা। গোরা আমাদের কাছে যতটা কবি প্রণীত ততটা ঔপন্যাসিক রচিত নয়। গোরা ঘটনামদির নয়। তার কাহিনী বুনোট রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও বেশ আলগা। গোরার আখ্যানভাগ রেখাবহুল নয়, সেই কতিপয় রেখা বর্ণবহুল নয় ও সেই বর্ণ আবার মিশ্র প্রকৃতির নয়। আমরা প্রথম থেকেই ধরে নিই যে গোরা রবীন্দ্রমননের চিহ্নায়ণ কিন্তু উপন্যাসের শিল্পরূপের প্রতি নিবেদিত কোনো নিবিড় আস্তিকতা থেকে বঞ্চিত। শতাব্দীর পারে এসে মনে হয় আমাদের সিদ্ধান্ত খুব বিবেচনা প্রসূত ছিল না। আজ চৈত্রের চরাচরে এই নির্মেঘ নিশীথে কেবলই মনে পড়ে পরেশবাবুর মৃদু উচ্চারণ—আকার যে অন্তবিশিষ্ট। রবীন্দ্রনাথ কি উপন্যাসের আকার অতিক্রম করতে চাইছিলেন?

'চোখের বালি' ও 'নৌকাডুবি'র পরবর্তীকালে 'গোরা' উপন্যাসে চলতিকালের অর্থ রূপান্তরিত হয়ে গেল। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা যে অর্থে ঐতিহাসিক রবীন্দ্রনাথের গোরা কোনোভাবেই তা নয়। তবু স্বয়ং কথকের মত অনুসরণ করে বলেই তা পারিবারিক নয়, তা ঐতিহাসিক। যদি আমরা স্থির বিবেচনার বশবর্তী হই তবে দেখব গোরা মূলত একটি গাণিতিক উপপাদ্যের মত। এখানে উপন্যাস শিল্পমাধ্যম হিসেবে কতটা তথাকথিত সার্থকতা পেছেয়ে— এরকম মীমাংসা অসমাপ্ত রেখে আমরা বরং দেখব 'গোরা' এমন এক সামাজিক পরিসর স্বকাল ও স্বদেশ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নানা মন্তব্য করেছেন। ফলে বাংলা উপন্যাস এই প্রথম সন্দর্ভের নিকটবর্তী হওয়ার সুযোগ পেল। গোরা বাস্তবিক উপন্যাসের কাঠামো ব্যবহার করে প্রবন্ধ লেখার প্রয়াস। লেখকের তত্ত্ববিশ্ব উপন্যাসের অবয়বকে ছলনা করে গেছে। রবীন্দ্রনাথের মূলসাধনা নিজের মতাদর্শগত অবস্থানের চলরাশি সমূহকে একটি ভাষাচিত্র দেওয়ায়। এ প্রসঙ্গে অবশ্য শিল্প ও দর্শনের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সিদ্ধির কথা চলে আসে। প্রসঙ্গক্রমে আমরা চকিতে তাকিয়ে নিতে পারি ফিয়দর দস্তয়েভস্কির কারমাজভ পরিবারের দিকে। মহাভারত প্রতিম এই লেখায় ঘটনার ঘনঘটা থেকে, চরিত্র ও পাত্রপাত্রিদের মনস্তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ থেকে ছুটি নিয়ে দস্তয়েভস্কি একটি অধ্যায়ের অবতারণা করেছেন যা কাহিনীপ্রবাহের পক্ষে অনিবার্য নয় এমনকি সম্ভবত পরিত্যাজ্য তবু গ্রান্ড ইনকুইজিটার পর্বে ঈশ্বরের সঙ্গে তার প্রসিদ্ধ সংঘর্ষ মানুষের মননকার্যের একটি দুর্মূল্য সম্পদ হিসেবে চিহ্নিত। কেননা উক্ত পরিচ্ছেদ বাদ দিলে কারমাজভে পারিবারিক জীবন তেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয় না অথবা আখ্যায়িকার অঙ্গহানি হয় না অথচ প্রবঞ্চিত বোধ করে মানুষের আত্মজিজ্ঞাসা প্রদেশ। তুলনামূলক পরিপ্রেক্ষিতে যদি স্থান করি ফ্লবেয়ারের 'মাদম বোভারি' কে তবে দেখব শব্দের সৌকর্য ও ভাষার স্থাপত্যে, চরিত্রের সংগঠনে ও কাহিনীর মসৃণ গমনছন্দে এমন একটি অবকাশও নেই যা অতিরিক্ত ও অমিতব্যয়ী। দস্তয়ভস্কির এই সংযোজনের নন্দনতত্ত্ব ও ফ্লবেয়ারের বাহুল্যবর্জিতার মধ্যে আধুনিক সমালোচক দস্তয়ভস্কিকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করে; কারমাজভ পরিবার উপন্যাসের অতিরিক্ত একটি সাংস্কৃতিক পরিসর। এই অধ্যায়টুকু না থাকলে গল্পের কোনো ক্ষতি হয় না কিন্তু মহাকালের শাসক থেকে দস্তয়েভস্কির পরিণাম ঘটে কালের পুতুলে। গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ওই অধ্যায়টি দস্তভস্কির ত্রুটি, গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ফ্লবেয়ারের সেই বিখ্যাত গদ্য বিবরণী যা রূপসীর শরীরের মতোই মেদহীন, রূপসীর ত্বকের মতই অব্যর্থ উপন্যাসের শিখর প্রদেশ। উপন্যাসের আঙ্গিক সম্ভাবনার বিচারে যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠ পাঠক ও বুদ্ধিজীবি মাদাম বোভারির দিকেই ঝুঁকে পড়েন। রবীন্দ্রনাথের গোরা বিষয়েও বাঙালি সমালোচক প্রায়ই সঙ্কুচিত। যেন রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের সীমা পার হয়ে ইতিহাস বা দর্শনের উদ্যানে প্রবেশ করেছেন, যেন সংলাপের বাগ্মিতা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেও আতিশয্যমদির করে তুলেছে। আমরা খেয়াল করিনা পৃথিবীর কবিরা সকলেই শুধু নিজের সাথে কথা বলে চলেন। আমরা শুধু আড়াল থেকে আড়ি পেতে তা শুনে ফেলি। হ্যামলেটের বিখ্যাত স্বগতোক্তির মত রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত নিজের সঙ্গেই তর্ক করতে চেয়েছিলেন দুর্নিবার ও বিরতিহীন। যারা গোরা উপন্যাসের চরিত্রদের অনেকটাই কালের পুতুল ভাবেন, ধরে নেন এরা ভাবজগতের ফানুস তাদের চোখেই পড়েনা গোরার তর্ক কত রক্তমাংসময়—গুজরাট ও মিজোরামে, পহেলগাও থেকে মাদুরাই, মন্ডল থেকে মুখোপাধ্যায়ে, জলে ও আগুনে কেবলই দৃশ্যের জন্ম হয় আর গোরাকে মনে হতে থাকে কালের রাখাল শিশু। এই উপন্যাসের শাশ্বত সাম্প্রতিকতাই প্রমাণ করে বৈশাখ ও ফাল্গুনে, দিন ও রাত্রিতে

রবীন্দ্রনাথে ইতিহাসের সঙ্গীও ইববেক। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই বাংলা উপন্যাসে এই সন্দর্ভ ধর্মিতা ইতিপূর্বে অজ্ঞাত ছিল। গোরা উপন্যাস পড়ার সময়ে তাই আখ্যানোন্তর্গত স্বর- প্রতিস্বরের চাইতে আখ্যান বহির্ভূত উপলব্ধি অনেক প্রাথমিক গুরুত্বের। পুনরাবৃত্তির দায় নিয়েই আমি বলব আমাদের আলোচ্য এই কাহিনি উপন্যাস বিকল্প হিসেবে যতটা সফল তার থেকে অনেক সার্থক আমাদের 'আলোকপ্রাপ্তি' জনিত মনোপরিসরের প্রতিবেদন রচনায়।

এবার তবে আমরা লেখকের মূল প্রয়াস বিষয়ে মন্তব্য করতে পারি। আমার মনে হয় এত লেখক - সর্বস্ব লেখা রবীন্দ্রনাথ কখনোই লেখেননি। এমনকি 'ঘরে বাইরে'র তুলনায়ও গোরা রবীন্দ্রনাথের বিভাজিত স্বর প্রকাশ করেছে। সবিনয়ে জানাই যে এরকম মনে হওয়া যথার্থ যে এই উপন্যাসের চরিত্রলিপি একটি ছলনা, আসলে লেখক নিজেই বহুরূপে পরিব্যাপ্ত। একুশ শতকে পা দেওয়ার আগেই বুঝতে পারছি রবীন্দ্রনাথ স্বদেশ বিষয়ে একটি জায়মান জাতি-রাষ্ট্রের ধারণার বিরুদ্ধাচরণ করতে চাইছেন, আর তা আদি ও ধ্রুপদী মার্কসবাদীদের থেকে স্বতন্ত্র আদলে। গোরা যখন ভারতবর্ষে প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে চায় তখন তা 'দলীয়' ভারতবর্ষ নয়, সে ভারতবর্ষ যৌথ বিস্মরণের পরপারে। রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষ ইতিহাসের অন্য একটি পাঠ থেকে জাত। ভূগোলের সীমা তিনি অকিঞ্চিৎকর ভাবেন। ইউরোপীয় মননের প্রভাবে জাত আধুনিক ভারতবর্ষের জাতি - রাষ্ট্রগত বন্ধন তিনি একটি প্রবল অমঙ্গলের সূচনা ভাবেন অথচ ব্যক্তি ও সমষ্টি সম্পর্কের যে পুনর্মূল্যায়ণ প্রয়োজন তাও অস্বীকার করেন না। ভারতবর্ষের প্রকৃতি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রচিন্তায় একধরণের অ্যামবিগুইটি রয়েছে আমাকে মেনে নিতে হবে কিন্তু সক্রিয়, জৈব ও মনীষাদীপ্ত বলেই উত্তেজনার দাসত্ব না করে তিনি ইতিহাস রচনার উপাদানগুলিকেই পরীক্ষা করেন। সাম্প্রতিক মেধাপ্রবাহের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে এডওয়ার্ড সৈদ'র প্রাচ্যবাদ তাঁর নয়, উনিশ শতকীয় বিক্রয়যোগ্য পণ্যের রূপকে যে ভারতবর্ষ প্রকাশিত হত রাজা, হাতি, সন্ন্যাসী ও যাদুকরের মাধ্যমে, আজ যা হয় অরুন্ধতী রায় বা অনাবাসী নারীদের রচনার অথবা ইংরেজি ভাষায় লিখিত কিছু ভারতীয় বিপণনধর্মে, তা থেকে রবীন্দ্রনাথ অনেক দূরে নির্জন পথে জ্যোৎস্না আলোকে সন্ন্যাসী একা যাত্রী। রাষ্ট্র বা অন্যকোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সর্বময়তার কাছে তিনি ব্যক্তির স্বরূপকে বশীভূত দেখতে চান না। যে নিঃসঙ্গতায় পরেশের নির্বাসন রবীন্দ্রনাথ তাকেই মনে করেন যথার্থ সিদ্ধি। গোরা যখন সংস্থার থেকে চ্যুত, কোনো বাণী ও মতাদর্শ যখন তাকে আর পরিত্রাণ করবে না, ভ্রষ্টস্বপ্ন গোরার আত্মদর্শনকেই তিনি ভেবেছেন তপস্যার ফল। রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষ ভিনসেন্ট স্মিথ বা রমেশচন্দ্র মজুমদারের নয়। আজ যখন দূরে কাছে কেবলই ঘর ভাঙে, গ্রামপতনের শব্দ হয়, সমরসজ্জাকে মনে হয় গায়ত্রীমন্ত্র রবীন্দ্রনাথ তখন আমাদের খণ্ডতার অবসান ঘটান।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কোন ভারতবর্ষের কথা বলতে উৎসুক? তাঁর ভারতবর্ষের, মানচিত্র এত গূঢ়, গোপন ও নিভৃত যে ইংরেজি শিক্ষিত 'প্রগতিশীল' ও সংস্কৃতপন্থী 'রক্ষণশীল' তার নাগালে পায় না।

গোরা কাহিনি উনিশ শতকের প্রান্তে এমন একটি কালপর্বের ইঙ্গিত করে যখন রাজনৈতিক স্তরে উপনিবেশবাদ বিরোধী সংগ্রাম শুরু হয়নি, অন্তত জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়নি কিন্তু বুদ্ধিজীবিদের মানসিক স্তরে উপনিবেশিকতা বিরোধী জাতীয়তাবাদের পলি জমে উঠেছে। বাঙালির মনোজগৎ দুভাগে বিভক্ত হতে শুরু করেছে। প্রথমটি জড়, ঐহিক ও পার্থিব— অর্থনীতি, রাষ্ট্র পরিচালনা ও কৃৎকুশলতার পৃথিবী যেখানে পাশ্চাত্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিস্থাপন হয়েছে ও প্রাচ্য পরাভূত। এই স্তরে পশ্চিমী আধিপত্য স্বীকৃত ও চিহ্নিত হচ্ছে। অনুকৃতিরও অভাব নেই। অন্যস্তরটি আত্মিক ও আধ্যাত্মিক যা একটি অন্দরমহল যেখানে আমাদের শ্বাসবায়ুর মত স্বাভাবিক অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয় আমাদের সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়। আর আপাতভাবে এই সমীকরণটি অনোন্যক। অর্থাৎ পশ্চিমের বাতায়ণ যত বেশি উন্মুক্ত হবে যত আমরা বহিরঙ্গের দক্ষতা অর্জন করতে পারব ততই আমরা ব্যাকুল হয়ে উঠব আমাদের অন্তরঙ্গে পৃথক সাংস্কৃতিক চিহ্নায়নের জন্য। এশিয়া ও আফ্রিকায় জাতীয়তাবাদের গঠনে এই দ্বিধা একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। সেই সূত্রে বলা যায় ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মুহূর্তে গোরা এমন একটি প্রহর যা আত্মিক ও আধ্যাত্মিককে সার্বভৌম মনে করে ও সেখানে বিদেশী অনুপ্রবেশ সহ্য করেনা। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ আবিষ্কারের সার্থকতা পরীক্ষা করলে সহজেই অনুমান করা যায় আমাদের সমাজ সংস্কার আন্দোলনও দুটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। প্রথম অধ্যায়ে আমরা নবীন শাসকদের দিকে তাকিয়ে থাকতাম যাতে তাদের অভিভাবকত্ব আমাদের কুপ্রথা ও জীর্ণ সামাজিক সংস্কারসমূহের সংস্কারের ফসল হয়। পরবর্তী অধ্যায়ে এই সংস্কারেচ্ছা প্রশমিত না হলেও বিদেশী প্রভুদের বিরুদ্ধে একটি প্রবল প্রতিরোধ গড়ে ওঠে যাতে তারা আমাদের সাংস্কৃতিক অন্তঃপুরে হস্তক্ষেপ না করতে পারে। পরিণত বঙ্কিমচন্দ্র এই পর্বের যথার্থ প্রতিনিধি। জাতীয়তাবাদী চেতনার পরিপ্রেক্ষিতেই গোরা আমাদের ঘুম ভাঙাল।

তবু নিদ্রাহরণের এই প্রক্রিয়াটি অত সরল ছিল না। যদিও রামমোহন বিদ্যাসাগর হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়দের সংস্কার প্রয়াস আমাদের জাতীয় সত্তার বহিঃত্বককে মূলত বদলাতে চাইছিল কিন্তু অন্তরাশ্রয় তাতে বিচলিত বোধ করেনি— এমন তো নয়। বস্তুত এই অন্তরাশ্রয়টিই শেষবিচারে অন্তঃসত্তা হয়ে ওঠে। কেননা জাতীয়তাবাদের আধুনিক পশ্চিমী ধারণা আমাদের চৈতন্য ইতিহাসের পক্ষে সবচেয়ে যুগান্তকারী আবেদন পাঠাল যে আমাদের একটি 'আধুনিক' জাতীয় সংস্কৃতির পত্তন হওয়া উচিত। হে পাঠক, দয়া করে মনে রাখুন নেশন তত্ত্ব একটি পশ্চিমী ধারণা। আমাদের দেশে সাহেবদের রাজত্ব চালু হওয়ায় এই ধারণার উদ্ভব। সুতরাং নেশন বলতে যদি একটি

অনুমিত জনগোষ্ঠি বোঝায় তবে এই অন্তরাশ্রয়েই তা পল্লবিত হবে। বস্তুত এই মনোকল্পনাতেই জাতি নামক ইমাজিনড কমিউনিটি স্বাধীন, যদি রাজনৈতিক স্তরে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু না হয়ে থাকে তথাপি, সার্বভৌম।

স্বতন্ত্র জাতিসত্তা নামের ধারণাটি কিভাবে বিকশিত হয় তার একটি নিদর্শন মুদ্রণযন্ত্রের বিকাশ যা বিবাদমান দুই পক্ষ গোরা ও পানুবাবু উভয়কেই একটি আধুনিক প্রকাশবাত্যয় হিসেবে বাংলা ভাষাকে ব্যবহার করার প্ররোচনা দেয়। আমরা যখন উপন্যাসের আঙ্গিককে দীর্ঘসংলাপকে বাহুল্য বিবেচনা করতে প্রলুব্ধ হই তখন খেয়াল করিনা পাদ্রি ও শেতাঙ্গর প্রশাসন, ঔপনিবেশিক বিচারালয় ও অনুশীলনের বাইরে এই ভাষাই সম্ভবত নবজাত দ্বিভাষিক শিক্ষিত বুদ্ধিজীবি শ্রেণীর আধ্যাত্মিক বিশুদ্ধতা রক্ষার হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। অ্যান্ডারসান জাতীয় আধুনিক সমাজবেত্তাদের লেখা পড়ে আজ বুঝতে পারি কেন গোরা ভাষার দীর্ঘ ও বিলম্বিত বিস্তারে যাবতীয় সামাজিক বিতর্ক যেমন নাস্তিক - আস্তিক, নারী-পুরুষ, স্বদেশ প্রেম-ব্যক্তি ইত্যাদিকে ব্যক্ত করে। ব্যক্ত করার অধিকার শুধু শাসকের নয়। ইংরেজি নয়, শাসিতেরও আর শাসিতের ভাষা বাংলা বলেই গোরা উপন্যাস উচ্চারিত ও অনুচ্চারিত বাক্যের সমাবেশে ভাগ্যের আধিপত্যকামী মনোভাবের একটি বিকল্প প্রস্তাব। গোরা উপন্যাস আধুনিক ভারতের ভারতীয় বুদ্ধিজীবির মনোগঠনে সেই 'অঞ্চল' যা সাংস্কৃতিক অবদমনের প্রত্যুত্তর। এই উপন্যাসের সর্বতোগামী বাক-বিভূতি অন্তত প্রমাণ করে আধুনিক পৃথিবীর উপযোগী মনোপ্রদেশ গঠনের কাজ শুরু হয়ে গেছে। যা আরও জরুরি যে মাতৃভাষার চর্চাই সেই ভিত্তিভূমি যেখান থেকে সার্বভৌমত্বের সংগ্রামের পূর্বঘোষণা করা যায়

যেমন এই নবজাত সংস্কৃতি পরিবার সংক্রান্ত সংস্কারগুলিকে পরীক্ষা ও পুনঃনির্মাণ করছিল। সমাজ সংস্কারের প্রথম যুগে যেভাবে বঙ্কিম 'রিপুর প্রাবল্য' দণ্ডিত করেছিলেন বিষবৃক্ষ উপন্যাসে সংস্কারের দ্বিতীয় যুগে রবীন্দ্রনাথ সেভাবে প্রণয়লিপ্সাকে শাস্তি দেন না। যা সনাতন ঐতিহ্য বলে নির্দেশিত হয়েছিল সে বিষয়ে উনিশ শতকের শেষ যুগের সংস্কারকেরা ভাবতে শুরু করেছিলেন যে আর প্রথম যুগের মত সতীদাহ নিবারণ বা বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের জন্য সরকারের নিয়ন্ত্রক ভূমিকাটি প্রধান নয়, যা জরুরি তা হল অভ্যন্তরীণ তর্ক ও সেই তর্কের বিস্তার। রবীন্দ্রনাথ সঙ্গতভাবেই যুগের মুখপাত্র হিসেবে মনে করেছিলেন পরিবার ও পরিবারের নারীর অবস্থানের প্রসঙ্গ যদি কোনো সমাধান দাবী করে তাবে আমাদের জাতিগত অস্তিত্বের এত বড় সমস্যায় জাতিকে প্রবেশ করতে হবে। এমনকি সাম্প্রতিক নারীবাদের চোখ দিয়ে দেখলেও যে নতুন পিতৃতন্ত্র হল তা সামন্ততন্ত্রের আদিরূপের থেকে স্বতন্ত্র; কিন্তু তা পশ্চিমী পিতৃতন্ত্রের থেকেও পৃথক। আর যে নারী সুচরিতা বা ললিতার মধ্যে দিয়ে গুণ্ঠনমুক্ত হয়েছে সে চিরন্তন ভারতীয় নারীত্ব থেকে দূরে কিন্তু তার মধ্যে এই নবজাগরণ এমনভাবে মুদ্রিত যে তাকে সাগরপারের মনে হবে না কিছুতেই। যদি যুক্তির কথা বলি তবে বরদাসুন্দরী যে ভাষায় কথা বলেন তা তাঁর স্তরের মহিলার পক্ষে অসম্ভব। অসম্ভব বলেই আমরা বুঝতে পারি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি অন্যত্র। বাস্তব নয়, বাস্তবের সম্ভাবনাই তাঁকে চিন্তিত রেখেছে এই উপন্যাসে। আর্ন্তজগতের মুক্তিই তাঁর তপস্যা। রবীন্দ্ররচনায় ভৌগলিক ভারতবর্ষ অনুপস্থিত। তিনি, রবীন্দ্রনাথ, অতীত ভারবর্ষকে হিন্দু ভারতবর্ষ মনে করেন না কিন্তু 'জাতীয়তা'র অভিধা নির্ণয়ে তিনি স্থানিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে গুরুত্ব দেওয়ার পক্ষপাতী। আর অন্তিমে আমরা আবিষ্কার করি স্বদেশী ইতিহাস থেকে তিনি চ্যুত হচ্ছেন। সমস্ত সংস্থা ও প্রতিষ্টান থেকে মুখ সরিয়ে তিনি ব্যক্তিকে একাকীত্বের প্রহরযাপনের নিয়তি নির্দিষ্ট করেছেন, গোরা পরেশবাবুকে মন্ত্রের অধিক শুদ্ধতায় জানায়— ''আপনার কাছেই মুক্তির মন্ত্র আছে সেইজন্যেই আপনি আজ কোন সমাজেই স্থান পাননি।'' এই নির্ণয় নিঃসঙ্গতা মানুষের চূড়ান্ত স্বর্গারোহণ পর্ব। রাষ্ট্র থেকে পরিবার পর্যন্ত সকলেই তাকে পরিত্যাগ করেছে, ব্যক্তির সেই ছিন্নগ্রন্থির প্রতি রবীন্দ্রনাথের আনুগত্য ও প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা গোরাকে আজ অন্য এক মাত্রা এনে দিয়েছে রুধিরাক্ত, নিশিযাপনে ক্লান্ত আসমুদ্র হিমাচলে। তবে কি রবীন্দ্রনাথ অন্তিমমূল্য পেতে চান প্রেমে: জানি না, তবে তাঁর এই উত্তরপুরুষে নিবেদন মনে পড়ে:

''মনে পড়ে কবে এক তারাভরা রাতের বাতাসে
ধর্মাশোকের ছেলে মহেন্দ্রের সাথে
উতরোল ঝড়ো সাগরের পথে অন্তিম আকাঙ্খা নিয়ে প্রাণে
তবুও কাউকে আমি পারিনি বোঝাতে
সেই ইচ্ছা সংঘ নয়, শক্তি নয়, কর্মীদের সুধীদের বিবর্ণতা নয়।
আরো আলো : মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়।''

ইতিহাসের আলো আসে। গোরা—সুচরিতার করবন্ধন সার্থক হোক। আমি নিশ্চিত ভারতবর্ষের ইতিহাস তাদের আশীর্বাদ করেছে।